ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ৮. ৭. জামা‘আত ও বাই‘আতের তত্ত্ব

বিশ্বের সকল সমাজের সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তাদের একটি বড় তত্ত্ব ছিল জামা‘আত ও বাই‘আত তত্ত্ব। তারা দাবি করত যে সমকালীন সকল মুসলিম দেশ ও সমাজ কাফির ও জাহিলী সমাজ। এগুলির সাথে কুফরী ও সম্পর্কচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন বলে গণ্য হবে না। আর কাউকে মুমিন বলে বা ‘‘দীনী ভাই’’ বলে চিনতে পারার একমাত্র মাধ্যম হলো বাই‘আত। শুধুমাত্র ‘জামা‘আত’ ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে। যতক্ষণ না কোনো মুসলিম তাদের ইমামের হাতে বাইয়াত করে তাদের ‘জামাআতে’ যোগ দিবে ততক্ষণ তাকে মুমিন বলে গণ্য কার যাবে না।

এ দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা‘আত বিষয়ক নির্দেশগুলিকে দলিল হিসেবে পেশ করে। তাদের এ দাবি মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল। কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা‘আতকে ঈমানের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। তারা এ পরিভাষাদ্বয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি। ভাষাবিদগণ জানেন যে, ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ যুগের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়। আরবী ভাষা যদিও কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সভ্যতার কারণে স্বাভাবিক বিবর্তন ও পরিবর্তন থেকে অনেকটা রক্ষা পেয়েছে, তবুও অনেক আরবী শব্দের অর্থ আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগের ব্যবহৃত অর্থ এবং বর্তমানে প্রচলিত অর্থের মধ্যে অনেক সময় আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের বক্তব্য ব্যাপক অধ্যয়ন এবং প্রাচীন মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন না করলে এ সকল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আরব পাঠকও বিভ্রান্ত হন। এরূপ বিভ্রান্তি শিকার হন ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ নেতৃবৃন্দ ‘জামা‘আত’ শব্দের ক্ষেত্রে। ‘জামা‘আত’ ও ‘বাই‘আত’ ইসলামের দুটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা। জামা‘আত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’’ গ্রন্থে।[1] এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, জামাআত শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘‘ঐক্য’’ বা ‘‘ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী’’। যে কোনো স্থানে যে মানুষগুলি থাকেন তাদের সমষ্টিকে বা তাদের ঐক্যবদ্ধতাকে ‘‘জামাআত’’ বলা হয়। জামাআতের বিপরীত হলো ফিরকা বা হিযব, অর্থাৎ দল বা গ্রুপ।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লি আছেন। এরা মসজিদের জামা‘আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থৎ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা‘আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক দিকে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ফিরকা ও জামা‘আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত

মসজিদের জামা'আত বা ঐক্য ভেঙ্গে ইফতিরাক বা দলাদলি এসেছে। তিনটি ফিরকা বা দল মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো 'দল' বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে 'জামা'আত' বলতে পারেন। আর এ অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ''জামাআত'' বলা হয়।

এভাবে একটি ঘর, মসজিদ বা মাহফিলের মধ্যে বিদ্যমান সকল মানুষের বা অধিকাংশ মানুষের সমষ্টি বা তাদের ঐক্যবদ্ধতাকে উক্ত স্থানের 'জামাআত' বলা হয়। যেমন বলা হয়, মসজিদের জামাআত, ঘরের জামাআত, মহল্লার জামাআত, মাহফিলের জামাআত। অর্থাৎ ঘর, মহল্লাহ, মসজিদ বা মাহফিলের সকল মানুষ। এ অর্থে অল্প কিছু মানুষকেও জামাআত বলা যেতে পারে, তবে তা 'সকল মানুষের ঐক্য' অর্থে নয়, বরং 'নির্ধারিত স্থানের সকল মানুষের ঐক্য' অর্থে। কুরআন-হাদীসে ''জামাআত'' বলতে ''জামাআতুল মুসলিমীন'' বা সকল মুসলিমের বা অধিকাংশ মুসলিমের ঐক্য বুঝানো হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও মূল আরবী ব্যবহার অনুসারে 'জামা'আত' অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠী বা সমাজ (community, society). বিভিন্ন হাদীসে 'জামা'আত'-এর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 'জামা'আত-বদ্ধ' থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 'বিচ্ছিন্ন হতে' নিষেধ করা হয়েছে। এ সকল নির্দেশের অর্থ, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সে সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সে সিদ্ধান্ত তার বা তার গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।

মূলত রাষ্ট্রীয় বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সকল নির্দেশনা দিয়েছেন। জামা'আত ও বাইয়াত বিষয়ক নির্দেশাদি একই সুত্রে বাঁধা। জামা'আত অর্থ সমাজ বা রাষ্ট্রের জনগণ বা তাদের ঐক্য এবং বাইয়াত অর্থ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ। আরবগণ প্রাচীন যুগ থেকে 'কাবীলা' বা গোত্রতান্ত্রিক বিভক্ত সমাজে বসবাস করত। ইসলামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিচ্ছিন্ন কবীলা বা গোত্র কেন্দ্রিক আরব সমাজকে বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক জনগণতান্ত্রিক পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে আনেন। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র প্রধানের আনুগত্য। বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত। গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা অবমাননাকর বলে মনে করত। এছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাবোধ তাদেরকে তাদের মতের বাইরে সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করতে প্রেরণা দিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিচ্ছিন্ন জাতিকে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি এজন্য বারবার তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বর্জন করা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে বা রাষ্ট্রহীনভাবে বাস করাকে তিনি জাহিলী জীবন ও এ প্রকারের মৃত্যুকে জাহিলী মৃত্যু বলেছেন। কারণ জাহিলী যুগের মানুষ রাষ্ট্র চিনত না এবং রাষ্ট্রহীনভাবে বসবাস করত। কাজেই এভাবে থাকা নিঃসন্দেহে জাহিলী জীবন ও এভাবে মরা জাহিলী মরা। পছন্দ হোক বা না হোক রাষ্ট্র প্রশাসনের আনুগত্য করতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কবীলা বা দলের মতামতের কারণে বা কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসনকে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি নিষিদ্ধ।

এ অর্থে তিনি যে সকল নির্দেশনা দিয়েছেন তা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তিনি মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করতে বলেছেন। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রতীক ''বাইয়াত'' বা ''আনুগত্যের শপথ'' সর্বদা

বজায় রাখতে বলেছেন। তিনি তাদেরকে ‘‘জামা‘আত’’ বদ্ধ থাকতে বলেছেন। এ সকল হাদীসের মর্মাথ একই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে এবং বিদ্রোহ, হানাহানি বা ক্ষমতা দখলের অবৈধ প্রক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।[2]
এ অর্থের হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। ইবনু আববাস (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من رأى من أميرِه شيئًا يكرهُه فليصبر عليه فإنَّهُ من فارقَ الجماعةَ شبرًا فمات (ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت) إلا مات ميتةَ جاهليةٍ

‘‘কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (মুসলিম সমাজ বা রাষ্টের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[3]
আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من خرج من الطاعةِ ، وفارقَ الجماعةَ ، فماتَ ، ماتَ ميتةً جاهليّةً

‘‘যে ব্যক্তি ‘তা‘আত’ বা ‘রাষ্ট্রীয় আনুগত্য’ থেকে বের হয়ে এবং জামা‘আত বা মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[4]
মু‘আবিয়া (রা) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান পদে মনোনয়ন দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে মু‘আবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ ইয়াযিদের জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনার বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি’র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_কে বলতে শুনেছি:

من خلع يدًا من طاعةٍ ، لقيَ اللهَ يومَ القيامةِ ، لا حُجَّةَ له . ومن مات وليس في عُنُقِه بَيعةٌ ، مات مِيتةً جاهليةً

‘‘যে ব্যক্তি ‘তাআত’ বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর পেশ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন ‘বাই‘আত’ বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[5]
রাষ্ট্রীয় ঐক্য বা ‘‘জামাআত’’ বিনষ্ট করা এত বড় অপরাধ যে, এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আরফাজা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إنه ستكون هنّاتٌ وهنّاتٌ فمن أرادَ أن يُفَرّقَ أمرَ هذهِ الأمةِ وهي جميعٌ ، فاضرِبُوهُ بالسيفِ كائنا من كانَ (من أتاكم وأمركُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أن يشقُّ عصاكُم أو يفرقَ جماعتكُم فاقتلوهُ)

"ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় (একজন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকা অবস্থায়) কোনো একব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা 'জামাআত' বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে।"[6]
আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إذا بُويِعَ لخليفتينِ ، فاقتلُوا الآخرَ منهما

"যদি দুজন খলীফার বাইয়াত করা হয় তবে যে পরে বাইয়াত নিয়েছে তাকে হত্যা করবে।"[7]
হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বলেন, মানুষেরা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি তাঁকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, এ ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপতিত হয়ে যায় কিনা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাদেরকে এ কল্যাণ এনে দিলেন। এর পরে কি আবার কোনো অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সে অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে কিছু জঞ্জাল-ময়লা থাকবে। আমি বললাম, সে জঞ্জাল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও রীতি অনুসরণ করবে। তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে। আমি বললাম, এ ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহবানকারীগণ (আবির্ভুত হবে), যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ-আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এ অবস্থায় পড়ে যাই তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন:

تلزمُ جماعةَ المسلمين ، وإمامَهم قلتُ فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ قال فاعتزل تلك الفِرقَ كلَّها ولو أن تعضَّ على أصلِ شجرةٍ حتى يُدرِكَك الموتُ وأنت على ذلك

"তুমি মুসলিমদের জামা'আত (সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোনো জামা'আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা

অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।’’[৪]

হারিস আশ‘আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أنا آمرُكم بخمسٍ ، اللهُ أمرني بهنَّ : السمعُ ، و الطاعةُ ، و الجهادُ ، و الهجرةُ ، والجماعةُ ، فإنه من فارق الجماعةَ قَيْدَ شبرٍ ، فقد خلع رِبقةَ الإسلامِ من عُنُقِه ، إلا أن يراجِعَ

‘‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন: শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা‘আত; কারণ যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জু নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসে।’’[৯]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের পরিভাষায় জামা‘আত বলতে ‘‘রাষ্ট্রীয় ঐক্য’’ বা মুসলিম সমাজ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ঐক্য বুঝানো হয়েছে। তারা যখন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন ব্যক্তিগতভাবে, দলগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে সে সিদ্ধান্ত অমান্য করা, নিজের মতের উপর অটল থাকা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতের বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ।

উপরের হাদীসগুলি মূলত কুরআনের এ বিষয়ক নির্দেশের ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘‘তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর ঐক্যবদ্ধভাবে; এবং দলেদলে বিভক্ত হয়ো না।’’[10]

এখানে আল্লাহ ‘জামাআত’ বা ঐক্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ‘তাফার্রুক’ বা দলাদলি করতে বা দলে দলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। জামাআতের সর্বোচ্চ নির্দশন ছিলেন সাহাবীগণ। এছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে ‘জামাআত’ বুঝাতে মুসলিম উম্মাহর আলিম সমাজের সমষ্টি বা ঐক্য বুঝানো হয়েছে বলে মনে করেছেন কোনো কোনো আলিম।[11] সর্বাবস্থায় সকলেই ‘জামা‘আত’ বলতে ‘সাধারণ জনগোষ্ঠী’ বা (society, community) বুঝিয়েছেন, কেউ ‘জামা‘আত’ বলতে ‘দল’ (group, party) বুঝান নি। আরবীতে ‘‘দল’’ বা সংগঠন বুঝাতে ‘ফিরকা’, ‘হিযব’ ‘কাওম’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ‘জামা‘আত’ নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, একটি নির্ধারিত স্থানের সকল মানুষ বুঝাতেও ‘‘জামাআত’’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এরূপ সীমিত ‘‘জামাআত’’ বা ঐক্য অর্থে আধুনিক যুগে কখনো কখনো জামাআত বলতে ‘‘দলবদ্ধতা’’ বুঝানো হয়। অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে কতিপয় মানুষের ঐক্য। এরূপ ঐক্য বা ‘‘জামাআত’’-ও ইসলাম নির্দেশিত। কোনো সফরে বা অন্য কোনো কর্মে বা উদ্দেশ্যে তিনজন মানুষ থাকলে একজনকে আমীর বা নেতা নিযুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।

এ অর্থে দীনী কর্মে ক্ষুদ্র পরিমন্ডলে মুসলিমগণ ‘‘জামাআতবদ্ধ’’ অর্থাৎ ‘‘একই কর্মে রত সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ’’ থাকতে পারেন; তবে উপরের আয়াত ও হাদীসগুলিতে ‘জামাআত’ বলতে এ ক্ষুদ্র ঐক্য বা ‘‘দল’’ বুঝানো হয় নি; মুসলিমদের সামগ্রিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত হওয়াকে ইসলাম পালনের অংশ মনে করার অর্থ ইবাদত পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে বিষয়কে শর্ত করেননি তাকে যুক্তি দিয়ে শর্ত বানিয়ে

নেওয়া। উপরন্তু এরূপ ধারণার দ্বারা ইসলাম নিষিদ্ধ ‘‘দলাদলি’’, ‘‘বিভক্তি’’ বা ‘‘বিচ্ছিন্নতা’’ একটি ইসলামী ইবাদত বলে পরিগণিত হবে! দীন পালন ও দীনী দাওয়াতে সামষ্টিক প্রচেষ্টা অধিকতর ফলদায়ক। ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য এরূপ ক্ষুদ্রতর বা আংশিক ‘‘জামাআত’’ (ঐক্য) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী উপকরন। কিন্তু দাওয়াতের জন্য ‘‘জামাআত’’ শরীয়ত-নির্দেশিত কোনো জরুরী বিষয় নয়। ‘সালাতের’ ক্ষেত্রে ফরয সালাত একাকী পালন করলে সাওয়াব কম হবে বা গোনাহ হবে বলে সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু ‘দাওয়াতের’ ক্ষেত্রে এ ইবাদত একাকী পালন করলে সাওয়াব কম হবে বা গোনাহ হবে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

এরূপ মনে করলে তা সুন্নাতের ব্যতিক্রম এবং বিদআতে পরিণত হবে। যেমন অধিক উপকার বা অনুরূপ কোনো যুক্তি দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, দরুদ-সালাম, যিকর ইত্যাদি ইবাদত পালনের জন্য ‘জামাআত’ বা দলবদ্ধতা, দন্ডায়মান হওয়া, চিৎকার করা ইত্যাদিকে উক্ত ইবাদতের অংশ মনে করা বা এ সকল ইবাদত একাকী পালন করলে, বসে পালন করলে বা মৃদু শব্দে পালন করলে সাওয়াব কম হবে বলে মনে করা।

‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’-এর বিভ্রান্তির কারণ হলো তারা ‘জামা‘আত’ বিষয়ক প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থকে ইসলামী পারিভাষিক অর্থ বলে দাবি করেন। এরপর সুন্নাতের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দীন পালন ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ‘‘দলবদ্ধতা’’ শর্ত বলে গণ্য করেন। ‘জামাআত’ বিষয়ক উপরের হাদীসগুলির আলোকে তারা দাবি করেন যে, দলের মধ্যে থাকা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ দল বা জামা‘আত পরিত্যাগ করাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে, আর জাহিলিয়্যাত অর্থই কুফরী। এছাড়া জামা‘আত পরিত্যাগ করাকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় ‘জামা‘আত’ ত্যাগকারী কাফির বলে গন্য হবে। উপরের আয়াত ও হাদীসগুলির নির্দেশনা হলো, মুমিনগণ দলাদলি করবেন না। ইসলামের মধ্যে কোনো দলাদলি থাকবে না; বরং সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। অন্তত মুমিন সকল মুমিনকে একদল বলে বিশ্বাস করবেন। দল, মত, বর্ণ, দেশ, কর্ম, মাযহাব ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে ‘‘অন্যদল’’ বলে মনে করবেন না; বরং এগুলি-সহ সকল মুসলিমকে একদল বলে বিশ্বাস করবেন। কিন্তু এ কথার ব্যাখ্যায় জামাআতুল মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘‘মুসলিম হতে হলে কোনো না কোনো দলে থাকতে হবে!’’ অর্থাৎ দলাদলি করতেই হবে! এ হলো কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ।

এ ভুল অর্থের ভিত্তিতে তারা দাবী করেন যে, ইসলাম পালনের জন্য কোনো না কোনো দলের মধ্যে থাকতে হবে। আর যেহেতু একমাত্র তারাই দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করছেন সেহেতু তাদের দলই একমাত্র সঠিক দল। যারা তাদের বিরোধিতা করেন তারা মূলত দীন প্রতিষ্ঠা ও দীনের বিজয় চাচ্ছেন না। এজন্য তারাও কাফির। জামা‘আতের পাশাপাশি তারা ‘বাইআত’-কেও ঈমানের অংশ বলে গণ্য করেন, কারণ বাইয়াত পরিত্যাগ করাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে। তারা বলেন দলের আমীরের হাতে বাইয়াতই হলো দলভূক্তির একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি তাদের দলের আমীরের হাতে বাইয়াত করে তাদের দলে যোগদান করবে শুধু তারাই মুসলিম বলে গণ্য হবে। যারা এভাবে তাদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করবে তারা কাফির বলে গণ্য হবে। উপরের আলোচনা থেকে এ সকল বিষয়ের বিভ্রান্তি আমরা বুঝতে পেরেছি। বস্তুত মুসলিমকে বা যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছে তাকে কোনো কর্ম, দ্ব্যর্থবোধক কথা, অপছন্দনীয় বিশ্বাস, আকীদা বা মতবাদের কারণে কাফির বলে গণ্য

করার প্রবণতা মুসলিম উম্মাতের জন্য সর্বদা বেদনা ও ক্ষতি বয়ে এনেছে। এ থেকে উম্মতের মধ্যে দলাদলি, মারামারি, সংঘর্ষ, সংঘাত ও সন্ত্রাসের জন্ম হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী উম্মাতের মূলধারার আলিমগণ ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। পাপের কারণে তো নয়ই, এমনকি ইসলামী বিশ্বাসের সাথে আংশিক বা বাহ্যিক সাংঘর্ষিক মতবাদ, বিশ্বাস বা আকীদার কারণেও তারা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলতেন না। তার কোনো ব্যাখ্যা বা ওজর আছে কিনা তা সন্ধান করতেন এবং ঈমানের বিষয়ে তার মুখের দাবির উপরেই নির্ভর করতেন। এজন্য খারিজী, শিয়া, মুতাযিলী, কাদারীয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত বিশ্বাস বা মতবাদের অনুসারীরা কুরআনের অনেক আয়াত ও ইসলামী অনেক বিশ্বাস অস্বীকার করলেও তাদেরকে কাফির না বলে বিভ্রান্ত বা ভ্রান্তিতে নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন। আমি ‘‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সম্মানিত পাঠককে বইটি পড়তে অনুরোধ করছি।

ফুটনোট

[1] কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা, পৃ. ৫৭৬-৫৮২।

[2] দেখুন: ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৭, শাওকানী, নাইলুল আউতার ৭/৩৫৬-৩৫৭।

[3] সহীহ বুখারী, ৬/২৬১২, নং ৬৭২৪, সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৭ নং ১৮৪৯।

[4] সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৬-১৪৭৭ নং ১৮৪৮।

[5] সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৮, নং ১৮৫১।

[6] সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৮, নং ১৮৫১।

[7] সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৮, নং ১৮৫১।

[8] সহীহ বুখারী, ৩/১৩১৯, ৬/২৫৯৫; সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৫।

[9] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১৪৮।

[10] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১০৩ আয়াত।

[11] শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি.), আল-ই’তিসাম ২/২৫৮-২৬৫। ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরান-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা, ৫৭৬-৫৮২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6923

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন